দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণব ধ্যান ধারণার স্বরূপ : বৈষ্ণব কাব্যের ভিত্তি ভূমি

আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি লোক গাথাই একদিন বৃন্দাবন গাথায় রূপান্তরিত হয়েছিল । জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের (প্রাক্ চৈতন্য) কথা ছেড়ে দিলে চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব রূপ কবিকুল তাঁদের পদাবলীর মাধ্যমে বৈষ্ণবদর্শনের এক অপূর্ব রসভাষ্য রচনা করেছিলেন । নীরস তত্ত্ব বৈষ্ণব কবিদের হাতে কোন্ কোন্ গুণে এত রসমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল তা আলোচনা করবার আগে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের মূল কথাটি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাক ।

শ্রৌত ও পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রমথনাথ তর্কভূষণ 'বৈষ্ণব ধর্ম বেদমূলক' বলে উল্লেখ করেছেন ।কয়েকটি বিষ্ণু সূক্তের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করে তিনি মন্তব্য করেছেন —— 'পরকে সুখী করিবার জন্য স্বার্থত্যাগ, ইহাই হইল বৈষ্ণবতার বিশেষ লক্ষণ ।... এই জাতীয় বৈষ্ণবভাবের উৎকর্ষ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে ও পর্যাপ্তভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে ।'

(''বাঙলার বৈষ্ণবধর্ম''—-- অবতরণিকা, পৃ: ।√.) । কৃষ্ণনাম জপের কথা অগ্নি পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতেও রয়েছে । মহাভারতে বিষ্ণু পূজার স্থলে 'বাসুদেব কৃষ্ণ' পূজার প্রচার হয়েছিল । দেবালয় প্রতিষ্ঠা, নামকীর্তন, 'বিশ্বজনীন প্রীতি' ইত্যাদি বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ তখনও ছিল । মহর্ষি বেদব্যাস জ্ঞান ও ভাবমুখী প্রেরণার সমন্বয় সাধনকরে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল্যবান গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন । আঠারটি অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় সংক্ষেপে যা বলা হয়েছে, বারটি স্কন্ধে বিভক্ত শ্রীমদ্ভাগবতে তাই বিস্তৃত ও দার্শনিকভাবে আঠারো সহস্র শ্লোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে । সেখানে অহংকার, বল, দর্প, ক্রোধের উপরে স্থান পেয়েছে অহেতুকী ভক্তি ।

দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব ধর্ম অভিনব রূপ লাভ করেছিল ।
''সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'' ''বহুস্যাৎ প্রজায়েয়'', ''একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম নানাস্তি কিঞ্চি ন্'' —-- বেদান্তের এই মূল সত্যকে স্বীকার করে ও ব্রহ্ম ও জীব, শক্তি ও প্রকৃতির রূপ নিয়ে মত বিরোধের অন্ত নেই । আচার্য শঙ্কর যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন তাকে খণ্ডন করে দক্ষিণ ভারতের

ভক্ত আলোয়ারগণ রামানুজাচার্যের অন্ততঃ হাজার বৎসর আগে (প্রমথনাথ তর্কভূষণের মতে) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ তথা ভক্তিবাদের চরম বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তামিল — রমণী অণ্ডাল শ্রীরঙ্গনাথের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। চতুর্ভুজ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর বামে শ্রীলক্ষ্মী দেবী এদের উপাস্য বিগ্রহ ছিল।

আলবার সম্প্রদায়ের বারোজন আচার্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। এদের মধ্যে শঠারি অনুভব করেছিলেন যে একমাত্র শ্রীভগবানেরই পুরুষত্ব আছে। অভিরাম আচার্য বিরচিত ''দ্রবিড়োপনিষৎ তাৎপর্য'' গ্রন্থে শঠারির কামিনী ভাবের বিবরণ আছে। তামিলভাষায় রচিত এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতীব প্রিয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে গোপীভাবের সাধনার পূর্বসূত্র এই গ্রন্থে রয়েছে বলে পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মনে করেন। (বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম, পৃঃ ০ — ৪১)

দক্ষিণ ভারতের আলোয়ারগণের সৃষ্টি সঞ্চিত এই ভিত্তিভূমির উপর যমুনাচার্য ও রামানুজের প্রচারিত তত্ত্ববাদ সমগ্র দেশে ভক্তির বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। সমগ্র দেশ যেন এই জন্যই আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। বৈষ্ণব ধর্মমত ও দর্শনকে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বাদিত্য, শ্রীরামানুজ এবং শ্রীমাধ্ব সমধিক প্রসিদ্ধ। তারপর শ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতে, জীব মায়াবদ্ধ। ব্রহ্ম বদ্ধ জীব থেকে পৃথক। বদ্ধজীবই সকল দুঃখের আকর। ব্রহ্মের নিত্য দাসত্বই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। শ্রীনিম্বাচার্য মনে করেন, মায়া ব্রহ্মের শক্তি হলেও ব্রহ্ম মায়াধীন নন। জীব প্রকার ভেদে তিন প্রকার — বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। ভগবানের কৃপা হলে মায়াধীন জীব মুক্ত হতে পারে।

ব্রহ্ম হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ — এই ত্রিবিধ শক্তির আধার। নন্দ নন্দন কৃষ্ণই পরম পুরুষ আর বৃষভানু দুহিতা শ্রীরাধাই পরমাপ্রকৃতি এবং কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান (''কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'') — এই হলো শ্রীনিম্বাচার্যের মত। বিধিমার্গীয় ও রাগমার্গীয় এই বিবিধ সাধনার কথা নিম্বাচার্য বলেছেন।

আচার্য রামানুজের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ। নির্বিশেষের কোন হদিস মিলেনা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন এই মতের অনুপন্থী।'' অতএব

শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ । মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্বিশেষ ।'' (শ্রী: চৈ: চ:, মধ্য, ৬/১৪২) রামানুজের ঈশ্বর চতুর্বাহু শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী । জীব ভগবানকে চায় কিন্তু কখনই ভগবানের সাথে অভিন্নতা লাভ করতে পারে না । স্বরূপে জীব নিত্য এবং পূর্ণ ব্রহ্মের অনুমাত্র । রামানুজ বলেন — মায়া বা অবিদ্যা কর্মের ফল — ব্রহ্মাশিতবা জীবাশ্রিত নয় ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন শ্রীমধ্বাচার্য । তিনি রামানুজের মতবাদকে বহুলাংশে স্বীকার করেছেন । মহাপ্রভুর প্রচারিত বাঙলার বৈষ্ণবধর্মে মধ্বাচার্যের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায় । তারমতে — জীবের একমাত্র কর্ম ভগবানের সেবা । ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ জীবের কাম্য নয় — কাম্য ভগবানের প্রেমলাভ ('পঞ্চম পুরুষার্থ এই প্রেম মহাধন' -- চৈ: চ: মধ্য, ২০।৪০৭) । শ্রীমধ্ব জীবের মুক্তির কথা বলেন । তাঁর মতে এই মুক্তিই পরম পুরুষার্থ । কিন্তু মহাপ্রভু মধুর রসাশ্রয়ে পতিজ্ঞানে পরম পুরুষের সেবাই জীবের একমাত্র লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন ।

ষোড়শ শতাব্দীর বল্লভাচার্য মধুরভাবকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । তার মতে শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে সেবাই ভক্তের পরম পুরুষার্থ । কিন্তু মহাপ্রভু অবৈধী প্রেমের তীব্রতাকে স্বীকার করে 'পরব্যসনিনী নারী'র গৃহকর্মের মাঝে মাঝে উপপতি সঙ্গ সুখলাভের কথা বলেছেন ।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব তৎকালীন বাঙালী সমাজে একটা অত্যন্ত যুগোপযোগী ঘটনা । চৈতন্য দেবের জন্মের পূর্বে মোগল — পাঠান শাসনের বিভিন্ন যুপকাঠে বলি হয়েছিল জন সাধারণ । ধর্মতন্ত্রের বাঁকা পথ গ্রহণ করেছিল । তর্ক, অনুষ্ঠান, আড়ম্বর স্থান লাভ করেছিল হৃদয়ের উপরে । সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধোগতির হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার একটা তাগিদ শ্রীচৈতন্য অনুভব করেছিলেন । প্রেম, ভক্তি, সর্বোপরি হৃদয়াবেগকে তিনি গ্রহণ করলেন হাতিয়ার হিসেবে । মাধুর্যময় সাধনা, যা দক্ষিণ ভারতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, মহাপ্রভু সেই মধুর রসের সাধনাকেই গ্রহণ করলেন । বাঙালী সমাজের পক্ষে তখনকার পরিবেশে এটাই ছিল অপরিহার্য ।

আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এইজন্য উল্লেখ যোগ্য যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে যেখানে আভাষে রাধা-কৃষ্ণের রাস-লীলার কথা বলা হয়েছে জয়দেব সেখানে রাধাকে পূর্ণাবয়ব দিয়েছেন ।

একমাত্র ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ছাড়া রাধা-কৃষ্ণের মধুর রসের এত উচ্ছল বর্ণনা আর ছিল না। চৈতন্য প্রবর্তিত মধুর রসের সাধনার পূর্বসূত্র তাই জয়দেব-বিদ্যাপতি- চণ্ডীদাস, এই কথা বলা চলে।

চৈতন্যদেব কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মতবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। নিজে আটটি শ্লোকছাড়া কিছুই রচনা করে যাননি। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের রচনা, বিভিন্ন জীবন চরিত ও মহাপ্রভুর নিজের জীবন ছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বোঝা যায়না। আমরা সংক্ষেপে মহাপ্রভু -প্রবর্তিত বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা ব্যাখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কিছু মূলকথা তুলে ধরছি।

ষড় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামী শ্রীরূপ 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু'তে শ্রীকৃষ্ণকে 'অখিল রসামৃত মূর্তিঃ' বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত: গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রসের আধারেই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে পরম ব্রহ্মকে বলা হয়েছে 'রসো বৈ সঃ'। চৈতন্য-পূর্বে যে চারজন বৈষ্ণবাচার্য ছিলেন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে রস স্বরূপ বললেও এই রসের স্বরূপত্ব বিশ্লেষণ করেননি। শ্রীরূপ গোস্বামীই সর্বপ্রথমে স্পষ্টভাবে। এই রসের স্বরূপত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। তারমতে রস শব্দের দু'টি অর্থ — আস্বাদ্যবস্তু ও আস্বাদক। ~~তার মতে রসশব্দের দু'টি অর্থ — আস্বাদ্যবস্তু ও আস্বাদক~~। কৃষ্ণভক্তের মনে শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদির দ্বারা কৃষ্ণ রতির উদয় হয়। কিন্তু ইহা মূলেই রস নয়। বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীভাবের সাথে মিশ্রিত হলে কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয়। ভক্তের রুচি ভেদে কৃষ্ণরতি শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর — এই ~~চঁ~~ পাঁচ রূপ ধারণ করে। এগুলো স্থায়ী ভাব। ভক্ত এই রসের মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় রস স্বরূপ। মধুর রস হ'ল শ্রেষ্ঠ। রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর আলোচনা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন —

''পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গননে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য় ॥
গুনাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতিরসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে ॥''

(শ্রী: চৈ:চ, মধ্য, ২১।৩৭৭)

শ্রীরূপ ''উজ্জ্বল নীলমণি'' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে উজ্জ্বল বা মধুর রসের ~~নায়~~ নায়ক বলে উল্লেখ করেছেন।

শুধু তাই নয়, এতদিন ভক্তিকে রসের মর্যাদা দেয়া হতো না । শ্রীরূপ ভক্তিকে রসের মর্যাদা দিয়ে তাঁর ''ভক্তিরসামৃত সিন্ধু''র দক্ষিণভাগে লিখেছেন —

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ ।
স্বদাত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তি রসোভবেৎ ॥ (১।২)

শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীমদ্ভাগবতকে আকর গ্রন্থরূপে গ্রহণ করেছেন । শ্রীরূপ গোস্বামী ভাগবতের – 'ভক্তিই কৃষ্ণভজনার মূল' এই সিদ্ধান্তকেই আরও ব্যাপক ও গভীর ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন । ''ভাগবত সন্দর্ভে'' শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নির্ণয়ের পর শ্রীজীবগোস্বামী সাধন ও সাধ্য-ভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করেছেন । সাধ্যভক্তিই প্রীতি বা প্রেম । এই প্রীতি বা প্রেমই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পঞ্চম পুরুষার্থ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের পরবর্তী পুরুষার্থ প্রেম বা প্রীতি) ।

সাধনভক্তি দুই প্রকার — বৈধী ও রাগানুগ । বৈধী ভক্তি শাস্ত্র-শাসনে অনুরাগ হীনভক্তি । রাগানুগাভক্তি বলতে বুঝায় ব্রজবাসীদের মধ্যে বিরাজমান রাগময়ী ভক্তির অনুবর্তিনী ভক্তি ।

বিরাজন্তী মভিব্যক্তং ব্রজবাসিজ নাদিষু ।
রাগাত্মিকা মানুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥
(... সিন্ধু, পৃঃ ১৬২)

এই রাগানুগা ভজন-পদ্ধতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।

অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বঃ সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে যে সম্পর্কটি রয়েছে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে তাই ব্যাখ্যাত হয়েছে । শক্তি ও শক্তিমানের মাঝে অথবা আগুন ও আগুনের দাহিকা শক্তির মাঝে একই সঙ্গে ভেদ ও অভেদ এই দু'টি সম্পর্কই রয়েছে । শ্রীজীবগোস্বামী 'ষট্সন্দর্ভে' এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা আছে । তাঁর মতে — জীব ও জগত স্বরূপতঃ ব্রহ্মের শক্তি সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ শক্তিমান ও শক্তির সম্বন্ধের ন্যায় । ডঃ রাধা-গোবিন্দনাথ 'অচিন্ত্য' কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন — 'অচিন্ত্যতা' কথাটির অর্থ 'inexplicable' 'অনির্দেশ্য' । ইহার অর্থ unthinkable নয় । (''গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন'' ভূমিকা – পৃঃ ১৪১) । সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট জীবের মধ্যে এই সম্পর্ক সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু অনির্দেশ্য বলেই 'অচিন্ত্য' নামে চিহ্নিত করা হয় । ভগবানের সঙ্গে ভক্ত এই সম্পর্কে আবদ্ধ বলেই

বৃন্দাবন ছেড়ে 'পাদমেকম্' যাবার উপায় নেই শ্রীকৃষ্ণের। ভক্তের মুখেও তাই শুনি — ''হৃদয় নিঙাড়িয়া যবে বাহির করিয়া দিব তবে তো শ্যাম মথুরাতে যাবে।' (চণ্ডীদাস)

রাধাতত্ত্ব : ''শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'' আছে —

রাধাকৃষ্ণ একআত্মা দুইদেহ ধরি
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥''(আদি, ৪।৩৪)

রাধাকৃষ্ণের ভক্ত প্রধানাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তিনি মহাভাবস্বরূপা আনন্দের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্যই রাধিকার সৃষ্টি শ্রীরাধিকা ~~স্ব~~ হ্লাদিনী শক্তি :—

''রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার
স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার ॥''
(শ্রী: চৈ:, আদি, ৪।৩৪)

রাধাত্ব লাভই জীবের কাম্য। যে রাধাত্ব লাভের করে তার অন্তর – বাহির সব কৃষ্ণময় —

''কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥''
(ঐ, আদি, ৪।৩৬)

ভক্ত বা রাধিকা কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিতে নিজের সুখ খুঁজে পায় কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য জাগতিক লোকলজ্জা, ভয় ভয় কোন ~~কিছু~~ কিছুই অপরিত্যাজ্য নয়।

কৃষ্ণতত্ত্ব : বৈষ্ণবদের প্রাণের ধন রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্ম। ''কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'' । তিনি জীবকে ~~স্বক~~ আকর্ষণ করেন অনন্তীর্থ যাত্রাপথে। এ পথ প্রেমের পথ। তিনি রস স্বরূপ। তিনি আনন্দ স্বরূপ – সত্, চিত্ ও আনন্দের আধার। তিনি শক্তিমান আর সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই শক্তি। তিনি জীবথেকে ভিন্ন হয়েও অভিন্ন। তিনি প্রেম করেন আবার প্রেম আস্বাদনও করেন। অন্যান্য অবতার তার অংশমাত্র। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান। তিনি অখিল রসামৃত সিন্ধু। তিনি মধুর রসের নায়ক। রসের মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রেমের সাধনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এক মহত্ পরিণতি

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
LIBRARY
RAJA RAMMOHUNPUR
73900
24 MAR 1981

মহাপ্রভু প্রচারিত সর্বজীবে দয়া, প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে ঈশ্বরের উপলব্ধি, গোস্বামীদের অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব, কৃষ্ণ ও রাধাতত্ত্বের সরস ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সর্বস্তরের মানুষকে এই প্রেমধর্মের বন্যায় প্লাবিত করে। মহাজন কবিরা এই সব রসবিশ্লেষনের আলোকে এমন এক কাব্য-ঐতিহ্য গড়ে তোলেন যা একাধারে লৌকিক ও অলৌকিক। চৈতন্যের দিব্য জীবন তাঁকে অবতারের মর্যাদা দেয়। চৈতন্য পরবর্তী কবিকুল তাঁকে রাধাকৃষ্ণের ভাব সমন্বিত মূর্তি বলে বন্দনা করেন —

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈ বাস্বাদ্যো
যেনাদ্ভুত মধুরিমা চ কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তি
লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥
(শ্রীঃ চৈঃ চঃ, আদি, ১।২)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসাধনার এই তত্ত্ব-ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কাব্যের অপূর্ব রসসৌধ।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণব কবিতার ভাবকল্পনা ও রূপরীতি : পরবর্তী বৈষ্ণবদের কাব্যে তার প্রভাব সম্ভাবনা ।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে বৈষ্ণবপ্রেম কবিতা প্রাচীন ভারতীয় লৌকিক প্রেম কবিতারই একটি বিশিষ্ট রূপ । রাধা-কৃষ্ণ ভারতীয় কবিমানস-ধৃত নর-নারীরই একটি বিশেষ রসময় বিগ্রহ । এই প্রেমগাথার প্রকাশ ভঙ্গি , প্রেমের গভীরতা, প্রথম প্রেমের চাঞ্চল্য , চাপল্য সবই পূর্ববর্তী প্রেম কবিতার কাঠামোর উপর ভিত্তি করে রচিত । পরিবর্তন, পরিমার্জন অবশ্যই কিছু হয়েছে । বিশেষ করে, বৈষ্ণব-কবিতা ক্রমেই তত্ত্বের বাহন হওয়ায় নানা প্রকার দার্শনিক উপলব্ধি এর সাথে যুক্ত হয়েছে । এই তত্ত্বের পটভূমি ব্যাখ্যাত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে । কিন্তু তত্ত্বভিত্তিক হলেও প্রেমকবিতা হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলীর আবেদন কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি । কবি কালিদাস রায় তার কারণ নির্দেশ করেছেন অতি সুন্দরভাবে —''পদাবলীর রচনার অঙ্গে সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোথাও নাই । ইহা থাকিলে সাধক-কবিদের মতে রসাভাস ঘটিত । আধ্যাত্মিক সার্থকতা পদাবলীর অঙ্গীভূত নয় — ব্যঙ্গীভূত । ইহা লীলাতত্ত্ব হইতে আরোপিত অথবা লীলা-তত্ত্বজ্ঞ পাঠকের মত হইতে সঞ্চারিত ।''

(পদাবলী সাহিত্য, পৃ: ৩১)

এই তত্ত্বনিরপেক্ষ হার্দ্য আবেদনই বৈষ্ণব কবিতাকে পরবর্তী বৈষ্ণবদের কবিতার রস-উৎস করে তুলেছে ।''বাঙ্গালী চিত্তের উপর বৈষ্ণব সাহিত্যের যে প্রভাব তাহারও জাতিধর্ম-নিরপেক্ষ ভাবে একটি সামগ্রিক রূপ আছে । জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও তার প্রকাশভঙ্গি আমাদিগকে এমনভাবেই পাইয়া বসিয়াছিল যে মনে হয়, দীর্ঘ চারি-পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া একটি সমগ্রজাতি তাহার মনের যতপ্রেমের কথা তাহা ঐ রাধা-কৃষ্ণের বাঁধুনিতে এবং সেই ব্রজলীলার ছন্দে ভাষায়ই প্রকাশ করিয়া গিয়াছে ।''

(ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ''শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ'', তৃতীয় সং, পৃ: ৩৩৬)

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বৈষ্ণবদের বাংলা কবিতায় বৈষ্ণব কবিতা ও ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবের কথা আলোচিত হয়েছে । এখানে সংক্ষেপে কিছু পূর্ব- সূত্র আলোচনা করা যেতে পারে । ভাগবতের ভক্তিধর্ম বৈষ্ণব